বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি ঃ

ঘুরে এলাম মংগার দেশ থেকেঃ ১

*অজয় রায়**

মংগার দেশ বলতে বোঝায় বৃহত্তর রংপুর জেলা। ব্রিটিশ আমলে এর পোষাকী বানান ছিল রঙ্গপুর। অবশ্য বলতে দ্বিধা নেই এক সময় সত্যিই নানা রঙ্গ ভরা ছিল এ দেশ অভাব আর অনটনের মধ্যেও। তিস্পা, ধরলা, ব্রক্ষ্মপুত্র-যমুনা বিধৌত দেশ ভাওয়াইয়া, চটকা, আর জাগসঙ্গীতের দেশ। মইষাল, গাড়িয়াল ভাই, ফান্দে পড়িয়া কান্দের দেশ। আব্বাস উদদ্দিন, হরলাল রায়, মহেশ্চন্দ্র রায়, রথীন রায় .. এদের দেশ, পঞ্চানন সরকার (বর্মণ), যাদবেন্দ্রনাথ তর্কালঙ্কার, সৈয়দ শামসুল হক, এদের দেশ, তুলসী লাহিড়ী, তৃপ্তি মিত্র গুর"দাস তালুকদারের দেশ, দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক, মজনু শা'হর দেশ। রতিরাম, শিবচন্দ্র, নুরল দিনের ... দেশ। মওলানা ভাসানীর পদচারণায় ধন্য এ দেশ।

মংগার দেশ বৃহত্তর রংপুর হলেও, এর তীব্রতা লক্ষণীয় গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম ও ব্রক্ষ্মপুত্রের বুকে বিপুল চড় এলাকা যা ব্রক্ষ্মপুত্রের পশ্চিম পাড় চিলমারী থেকে পুর্ব তীর আসাম সীমান্ত ঘেষে রৌমারী উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ব্যপক অঞ্চল। ভাটির দেশে এ শব্দটি কিছুদিন আগ পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু কি এর অর্থ। মংগা শব্দটি উত্তর বঙ্গে প্রচলিত একটি দেশজ শব্দ। এর অর্থ উ"চ মুল্য বা দুর্মুল্য। যেমন বলা হয় 'বাজার বেজায় মংগা'; এর অর্থ হল বাজারে জিনিস-পত্রের দাম খুব চড়া। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত অভিধানে এটি লেখা হয়েছে 'মঅংগা' রূপে এবং বলা হয়েছে চট্টগ্রামে ব্যবহৃত হয় এবং অর্থ লিখেছেন 'দুর্মুল্য' এবং একটি উদাহরণ দিয়েছেন 'আমতলে আম মঅংগা' (প্রবাদ)- আম গাছ তলায় আম খুব দুর্মুল্য। তাঁরা হয়তো তখন জানতেন না যে উত্তরাঞ্চলে একই অর্থে ব্যবহৃত এটি একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। হিন্দিতে বলা হয় 'মহংগা', আর সংস্কৃতে 'মহার্ঘ'। ড. শহীদুল্লাহ মনে করেন শব্দটি সংস্কৃত 'মহার্ঘ' শব্দ থেকেই উদ্ভুত। (বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫)। উত্তরাঞ্চলে আর এক অর্থেও শব্দটি বহুল প্রচলিত- অভাব বা দুর্ভিক্ষ বোঝাতেও এটি ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় 'দ্যাশে এখন মংগা চলেছে বাহে' অর্থাৎ দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজমান।

বেশ কিছুদিন থেকে, বিশেষ করে কুড়িগ্রাম-গাইবান্ধাদি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষাবস্থা অর্থাৎ মংগা চলছে বলে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় উদ্বেগজনক খবর আসছে। কৌটিল্যের মতই অর্থশাস্ত্রে পণ্ডিত আমাদের অর্থমন্ত্রী অবশ্য আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে সরকম কিছু নয়। মংগা শব্দের তিনি অর্থ জানেন না, এবং সংবাদ পত্রের এসব ছবি মুদ্রণ ও সংবাদ প্রচারণা আমাদের দেশের সুনাম (না কি ভাবমুর্তি ?) নষ্ট করার উদ্দেশ্যে পরিবেশিত। অর্থমন্ত্রীর অজ্ঞনতার কারণে উত্তরাঞ্চলে মংগা হবে না, বা হ"েছ না এ তো হয় না।

---

* weÁvbx, cvewÜK I wekwe`¨vj‡qi Aemi cÖß AaïvcK

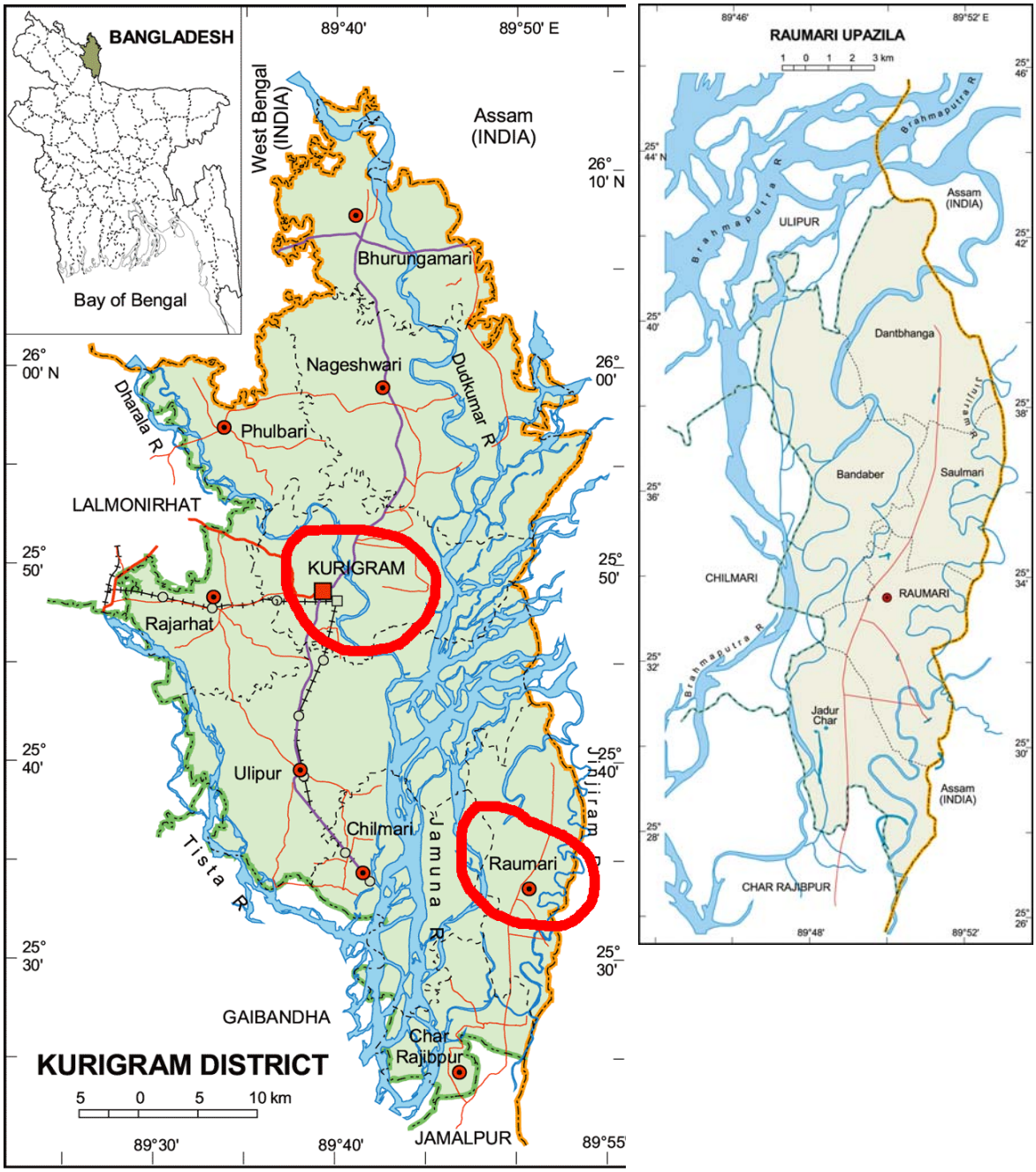

ছবি : মানচিত্রে কুড়িগ্রাম জেলা এবং রৌমারী

কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম মংগার দেশে কুড়িগ্রাম জেলার 'রৌমারী'তে । না, মংগা দেখতে নয়, কিংবা মংগা কবলিত দরিদ্র মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াতেও নয়। সে সামর্থ্য আমার নেই। সেটা করবেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আর সরকারে যারা উপবিষ্ট মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। আমি গিয়েছিলাম স্থানীয় শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের একটি কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করতে ২৮-২৯ শে অক্টোবর। আমার সাথে ছিলেন

মঞ্চের অন্যতম নেতা সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম এবং স্থানীয় সামাজিক নেতা জনাব খালেখ, গাইড হিসেবে। শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের অন্যতম কার্যক্রম হল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার কি হালচাল ও সমস্যাগুলোর সাথে পরিচিত হওয়া; প্রাথমিক স্তর থেকে কলেজ স্তরে বিদ্যায়তনগুলোর সমস্যা নিয়ে স্থানীয় সমাজকর্মী, শিক্ষানুরাগী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তি, সাংবাদিক, অভিবাবক, গণ্যমান্য থেকে সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের সাথে আলোচনায় মিলিত হওয়া এবং মত বিনিময় করা- যাতে স্থানীয়ভাবে বা জাতীয় স্তরে সমস্যাগুলোর সমাধানে আমরা, সামান্য হলেও, কিছুটা উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি। আমরা অবশ্য আমাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বেশ সচেতন। আমাদের আর একটি লক্ষ্য আমাদের আন্দোলনকে গ্রামীন সরল মানুষদের কাছে যাওয়া - শিক্ষা যেন শহুরে জীবনে আবদ্ধ না থেকে গ্রামের মুক্ত পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে।

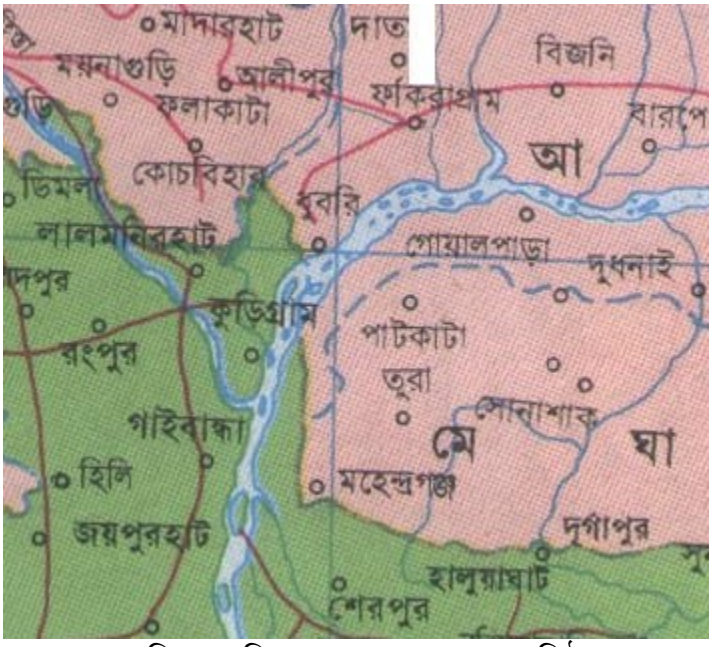

ছবি : মানচিত্রে পুরাতন কামরূপ রত্নাপিঠ

সাম্প্রতিক কালের বন্যায় আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা মঞ্চের পক্ষ থেকে *মুক্ত-মনা* ও অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের সাথে মিলিত হয়ে বন্যার্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছি। তাৎক্ষণিক 'রিলিফ' দেওয়া ছাড়াও আমরা পুনর্বাসনমুলক একটি কর্মসুচী গ্রহণ করি। এরই সুত্র ধরে আমরা আমাদের সংগঠনের সাধ্যের মধ্যে দেশের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি স্কুলকে নির্বাচন করি ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলটির পুনর্গঠনে অংশ গ্রহণ করতে।

এ দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমার রৌমারী ভ্রমণ। আমরা যাত্রা শুর" করলাম ঢাকা থেকে ২৮ শে অক্টোবর সকাল সাড়ে সাতটায় একটি মাইক্রোবাস নিয়ে। গাজিপুর-জয়দেবপুরের শালবনের ভেতর দিয়ে ভালুকা-নজরর"লের স্পর্শধন্য 'ত্রিশাল-হরিরামপুর' হয়ে মৈমনসিংহে যাত্রা-বিরতি। সময় তখন সকাল ১০-৩০। বন্যার পর অনেকদিন গত হয়েছে অথচ বিদ্ধস্ত এবরো থেবরো রাস্তা এখনও মরামত হয় নি। তাই দুঘণ্টার রাস্তা

অতিক্রম করতে লাগল ৩ ঘণ্টা, আর বৃদ্ধ বয়সের কোমরের ওপর ক্রমাগত উপর-নীচ ধাক্কার শক সামলানোর ঝক্কি।

এর পরে আমাদের আশু গন্তব্যলক্ষ্য শেরপুর - সেখানে রয়েছেন আমার পুর্বপরিচিতা স্বনামধন্যা সমাজসংস্কারের নেত্রী রাজিয়া সামাদ। সম্ভব হলে সামান্য যাত্রাবিরতি ঘটিয়ে পরিচয়টিকে একবার ঝালিয়ে নেয়া। শেরপুর অভিমুখে রাস্তা বেশ ভাল, অর্থাৎ ঢাকা-মৈমননিংহের মত অত বিদ্ধস্ত নয়। তবে মাঝে মধ্যে বেশ খারাপ এবং মেরামত জনিত অসুবিধা। শেরপুর পৌঁছালাম ১-৩০ এর দিকে। সময়ের কারণে রাজিয়া সামাদের সাথে দেখা করার ইচ্ছে বাতিল করতে হল। আমাদের যাত্রাপথে পের হলাম শ্রীবর্দী, এবং বক্সীনগর হয়ে কামালপুর অতিক্রম করে এলাম পাথরের চর খেয়াঘাঠে। বক্সীনগর পৌঁছানোর আগে গাড়ী বিকল হল। ত্রুটি সারতে আধঘণ্টা লেগে গেল গাড়ীচালকের। তবুও অল্পের ওপর দিয়ে সমস্যা অতিক্রম করা গেল- এজন্য ওপরওয়ালা অবশ্য ধন্যবাদ পেতে পারেন। কামালপুর অতিক্রম করে খেয়াঘাট যাওয়ার পথে রাস্তার পুর্বপার্শ্বে অরণ্যরাজীর মনোরম শোভা, আর মেঘালয়ের গাড়ো পাহাড়ের শ্রেণী সত্যিই মনকে দোলা দেয়। ভারতীয় সীমান্ত ঘেষে আমাদের চলার পথ, মাঝে মাঝেই রয়েছে বি.ডি.আর এর চৌকি। কতদিন এমন চমৎকার প্রাকৃতিক নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখিনি। পাহাড়গুলো মনে হচ্ছে কত কাছে, হাত বাড়ালেই যেন ছোঁয়া যায়। সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়ের অপুর্ব লেখা 'পালামৌ'র প্রবন্ধটির কথা মনে পড়ে গেল। খেয়া পরাপার ব্যবস্থা বেশ চমৎকার - গ্রামের মানুষের নিজেদের কৃৎকৌশল প্রয়োগের এক অপুর্ব নিদর্শন। দুটি মাঝারি আকৃতির নৌকাকে জোরা দেওয়া হয়েছে শক্ত ও মজবুত রজ্জু দিয়ে, তার ওপর বিছিয়ে দেয়া হয়েছে 'মাক্লা' বাঁশের বাতা (বাঁশ ফেরে লম্বা পাতলা ফালিকে উত্তরবঙ্গে বলে 'বাতা'; পুব বাংলায় বলে 'কাইম') দিয়ে তৈরী দৃঢ় পাটাতন, যার ওপর অক্লেশে দুটো বড় মাইক্রোবাস চাপিয়ে দেয়া যায়। ফেরিতে ওঠানামার পাটাতনও একই ধরণের বাঁশ দিয়ে তৈরী। সুন্দর সহজ ব্যবস্থা। শ্যালো ইঞ্জিন চালিত এই ফেরি-যান ১০ মিনিটেই আমাদের ওপারে পৌঁছে দিল, ফাউ হিসেবে পেলাম মাঝির সৌজন্য ও আন্তরিকতা। নদীটির নাম জিঞ্জিরাম (মতান্তরে জানজিরাম), কিন্তু শোনায় জিঞ্জিরা নদী। নদীটি নেমে, এসেছে মেঘালয়ের পাহাড় থেকে, সীমান্তের ওপারে এর অন্য নাম- পারের একজন জানাল 'কালা নদী'। মেঘালয় সীমান্ত খুব কাছে, নদী ধরে নৌকা পথে সহজেই ঢোকা যায়। এই পথে দুদেশের মধ্যে মাল আসা যাওয়া করে, বৈধ না হলেও কার অজানা নয়। শীত কালে কোন এক সময় ওপারে বেশ বড় মেলা বসে, তখন সীমান্ত খুলে দেয়া হয়। এপারের অনেক মানুষ মেলায় যায়, আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা করে আসে; ওপারের মানুষও সুযোগ গ্রহণ করে- এপারের নিকটজনদের সাথে মিলিত হয়। দেখলাম নদীর ওপর নির্মিত সেতু প্রায় সমাপ্ত। মনটা একটু বিষাদগ্রস্ত হল- এমন চমৎকার ফেরি ব্যবস্থাটি হঠাৎ করেই উঠে যাবে। এর সাথে জড়িত মানুষগুলোকে অন্য কোন পথ অবলম্বন করতে হবে, অন্য কোন আয়ের পথ খুঁজতে হবে। ভাবতে কষ্ট হয়। সভ্যতা ও আধুনিকতার নামে, সহজ যোগাযোগের নামে এবং সময় বাঁচানোর নামে, আমরা কত মানুষকে দুরবস্থায় ফেলেছি, অসুবিধার ও দঃখকষ্টের কারণ হয়েছি তার হিসেব রাখি না। রাজীবপুর-রৌমারীর প্রত্যন্ত অঞ্চলকে পুর্বদিকে এই নদীটিই এবং পশ্চিমদিকে বিশালকায় ব্রহ্মপুত্র নদ মুল ভুখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

ওপার থেকে যাত্রা শুরু হল আবারও - পথ বন্যার কারণে বেশ ভাঙাচোরা। মেরামতের কোন লক্ষণ চোখে পড়ল না। দুদিকের ভাঙনে, অনেক স্থানে রাস্তা বেশ সঙ্কীর্ণ- অনেক কষ্টে ও সন্তর্পনে আমাদের অতিক্রম করতে হচ্ছিল পথ। রৌমারী থেকে শেরপুর পথে কোন বাস চলাচল করে না- প্রথমত রাস্তা বাস চলাচলের উপযোগী নয়, দ্বিতীয়ত জিঞ্জিরাম নদী। এর ফলে স্থানীয় বিকল্প যান-বাহন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। মানুষ যে স্বতঃভাবেই সৃষ্টিশীল

এটি তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে। যে সব ছোট পাওয়ার টিলার জমি কর্ষণে ব্যবহৃত হয়, সে ধরণের টিলারে গ্রামীন কৃৎকৌশল প্রয়োগে ১০-১২ জন যাত্রীর বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদের চমৎকার একটি স্থানীয় নাম আছে 'ছমিরন'। আর দেখা যায় শ্যালো ইঞ্জিন চালিত ত্রিচক্র (অনেকটা রিক্সার মত) একটি আধারের ওপর জনা ছয়েক যাত্রীর বসার ব্যবস্থা করে এক ধরণের যান চলাচল করছে, অর্থাৎ ভ্যানের সাথে শ্যলো ইঞ্জিন লাগিয়ে এটিকে এক ধরণের অটোমবাইলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এদেরেকে বলা হয় 'করিমন'। দাঁতভাঙা থেকে জিঞ্জারাম নদীর পার পর্যন্ত মোটামুটি উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত পথ ধরে স্থানীয়ভাবে এক গঞ্জ থেকে আর এক গঞ্জে যাতায়াত করছে এসব বিচিত্র যান। কোন রিক্সা নেই, পরিবর্তে রয়েছে সাধারণের জন্য জনপ্রিয় 'ভ্যান'। আর রৌমারী থেকে শেরপুর পর্যন্ত যাতায়াত করে ছোট মাইক্রোবাস- ঠেসে বসানো হয় জনা ১৫ যাত্রীকে। রাস্তা ভয়ানকভাবে খারাপ আর মুড়ির টিনের মত ঠাসা যাত্রী, সুতরাং যাত্রীদের দুর্ভোগের অন্ত নেই।

নদীর ওপারেও দু'এক কিলোমিটার পথ দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত। যেতে যেতে এসব বিচিত্র ধরণের যান অতিক্রম করতে হ'ছিল, ফলে রৌমারীর দুরত্ব ক্রমশ বেড়েই চলছিল। অবশেষে আমরা প্রবেশ করলাম রাজীবপুর চর - একটি স্বাগত বাণী খোদিত চৌকাকৃতির কঙ্কিটের স্ল্যাব আমাদের জানিয়ে দিল আমরা রাজীবপুর উপজেলায় ঢুকলাম, যা প্রশাসনিকভাবে কুড়িগ্রাম জেলার অধীন।

অবশেষে রাজিবপুর উপজেলা শহর অতিক্রম করে রৌমারী শহরে উপনীত হলাম, ঘড়ির কাটা তখন সাড়ে তিনটা অতিক্রম করে গেছে। কয়েক বছর আগে নির্মিত উপজেলার ডাক বাংলোতে আমাদের স্বাগত জানালেন স্থানীয় শিক্ষানুরাগী, সমামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ। ওখানেই বিশ্রাম ও থাকার ব্যবস্থা।

রৌমারী, আমার ভালবাসার একটি স্থান:

আমাদের ৯ মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যে সব অঞ্চলে মুক্ত বাংলার পতাকা কখনও নামেনি, এর মধ্যে রৌমারীর স্থান সর্বাগ্রে। এখানে মুজিবনগর সরকারের বেসামরিক প্রশাসন স্থানীয় সিভিল ও সামরিক নেতৃত্বের সহায়তায় কার্যকর ছিল সব সময়। তখন একবার কয়েকদিনের জন্য এ অঞ্চলে আসবার স্মৃতি আমার জন্য এখনও রোমাঞ্চকর অনুভুতি।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েই আমরা রৌমারী সি. জে. জামান হাই স্কুলে মিলিত হলাম সুধী সমাবেশে। আয়োজক শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের রৌমারী উগকমিটির নেতৃবৃন্দ। সুধী সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন অন্যান্যদের মধ্যে রৌমারী সি. জি. জামান উ"চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও মুক্তিযোদ্ধা জনাব আজিজুল হক মাষ্টার, রৌমারী থানার সমাজ কর্মী জনাব আবদুল খালেখ, জনাব ফেরদৌস, স্থানীয় সুপরিচিত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাক্তি জনাব আবদুস সবুর ফার"কী, কুড়িগ্রাম জজকোর্টের এডভোকেট জনাব আমজাদ হোসেন, খেদাইমারী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইফুল ইসলাম বাবুল, সমাজ কর্মী জনাব আবদুর রশীদ, রৌমারী মহিলা কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের প্রভাষক মোঃ আবদুল হাই, জনাব মহিউদ্দিন আহমদ কুড়িগ্রাম-চিলমারী-রৌমারী এলাকার জনদরদী সামাজিক আন্দোলনের সুপরিচিত ব্যক্তি শ্রী শুভ্রাংশু চক্রবর্তী প্রমুখ। আলোচনা সভায় সভাপত্বি করেছিলেন রৌমারী হাই স্কুলের শিক্ষক জনাব মজিবুর রহমান। আলোচনায় সভায় বক্তরা সার্বিক ভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে স্থানীয় শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যগুলোর ওপর আলোকপাত করে ও

সমাধানের উপায় বাৎলে মনোরম বক্তব্য রাখেন। আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁদের কথায়। আমি কেবল বলেছিলাম আমরা চাই শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য ও নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে তা সমাধান কল্পে একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে সমাজের সুধীজনকে নিয়ে। আমরা চাই শহরে আবদ্ধ শিক্ষাকে গ্রামীণ মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসতে। সন্ধ্যেবেলা পুনরায় ঘরোয়াভাবে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হল, অবশ্য শিক্ষা সমস্যাই এ আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে রৌমারীর অবস্থান ও অবদান সম্পর্কেও নতুন করে শুনলাম অনেক অজানা তথ্য। সংস্কৃতির কথা উঠল। পরদিন, অর্থাৎ ২৯শে অক্টোবর সকাল ১১ টায় খেদাইমারীতে অনুষ্ঠান।